بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ মোতাবেক ১৪ নবুয়্যত, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বিগত খুতবাগুলোতে মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধাভিযান এবং এসব যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবনচরিত বা আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ প্রসঙ্গে তাবুকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ উল্লেখ করা হচ্ছিল। এর আরো বিস্তারিত বিবরণ হলো: লেখা আছে, এই সময়ে একজন মহিলা পরম নিষ্ঠা ও উদ্দীপনা প্রদর্শন করেছেন। এটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যুদ্ধের জন্য মহিলারাও যে-কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগামী ছিলেন, যেক্ষেত্রে তারা নিজেদের অলংকারাদি খুলে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেছেন। অনুরূপভাবে আবেগের কুরবানীরও একটি ঘটনা ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলিতে সংরক্ষিত রয়েছে, যার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন:

যেহেতু সৈন্যবাহিনী সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করছিল এবং মূতার যুদ্ধের দৃশ্য মুসলমানদের চোখের সামনে ভাসছিল, তাই প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে মহানবী (সা.)-এর জীবনের নিরাপত্তার চিন্তা অন্য সকল চিন্তার চেয়ে বেশি কাজ করছিল। নারীরাও এই বিপদ অনুভব করছিলেন এবং নিজেদের স্বামী-সন্তানদের যুদ্ধে যাবার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করছিলেন। এই নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার মাত্রা এভাবে অনুমান করা যায় যে, একজন সাহাবী– যিনি কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন– তিনি এমন সময় ফেরত আসেন যখন মহানবী (সা.) সেনাদলসহ মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তিনি এই ভেবে গৃহে প্রবেশ করেন যে, নিজের স্ত্রীর সাথে গিয়ে দেখা করবেন এবং আনন্দিত হবেন, আর তিনি তার স্ত্রীকে উঠানে বসে থাকতে দেখেন এবং ভালোবাসার সাথে আদর করার জন্য অগ্রসর হন। যখন তিনি স্ত্রীর নিকট যান তখন তার স্ত্রী দুই হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে পেছনে সরিয়ে দেন। সেই সাহাবী অবাক হয়ে নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান এবং জিজ্ঞেস করেন, এতদিন পরে দেখা হওয়া সত্ত্বেও এমন আচরণ কেন? স্ত্রী বলেন, তোমার কি লজ্জা করে না? আল্লাহ্‌র রসূল এমন এক বিপজ্জনক স্থানে যাচ্ছেন আর তুমি নিজের স্ত্রীর কাছে প্রেম নিবেদনের দুঃসাহস দেখাচ্ছ! প্রথমে (সেখানে) যাও এবং নিজের কর্তব্য পালন করো, এরপর এসব বিষয় দেখা যাবে। সেই সাহাবী তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েন, নিজের বাহনের ওপরে জিন চাপান এবং তিন মঞ্জিল পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হন।

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্য আরেক স্থানেও বর্ণনা করেছেন। প্রথমটির উল্লেখ রয়েছে 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এ। আর দ্বিতীয়বার তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক ইজতেমায় প্রদত্ত বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। তিনি (রা.) বলেন:

একদা মহানবী (সা.) একজন সাহাবীকে কোনো কাজে বাইরে প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তাবুক যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। এই অভিযানটি খুবই বিপজ্জনক ছিল। রোম সাম্রাজ্য তখন এমনই শক্তিশালী ছিল যেমনটি বর্তমানে আমেরিকা এবং রাশিয়ার সরকার। মহানবী

(সা.)-কে একটি ছোট্ট বাহিনী নিয়ে এত বড়ো সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে (অভিযানে) যেতে হয়েছিল। মদীনায় খুব কম সংখ্যক মুসলমান ছিল আর আশেপাশের লোকজনও সংঘবদ্ধ ছিল না, কিন্তু তারা একত্রিত হলেও রোমান সম্রাটের মোকাবিলায় তাদের তেমন কোনো মূল্যই ছিল না। তাই মহানবী (সা.) বলেন, সবাই যেন যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়। ইসলামী সৈনদল যাত্রা করার পর সেই সাহাবী– যাকে মহানবী (সা.) কোনো কাজে বাইরে প্রেরণ করেছিলেন– তিনি ফিরে আসেন। তিনি যুবক ছিলেন, নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল। এক দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তিনি যখন তার গৃহে প্রবেশ করেন তখন তিনি তার স্ত্রীকে উঠানে বসা দেখতে পেয়ে সোজা তার কাছে যান এবং তাকে আলিঙ্গন করতে চান, কিন্তু স্ত্রী তার এই প্রেম নিবেদনে সাড়া দেবার পরিবর্তে দুই হাত দিয়ে তার বুকে সজোরে আঘাত করে পেছনে ঠেলে দিয়ে বলেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছেন আর তোমার স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা উথলে উঠছে? আল্লাহ্‌র কসম! যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিরাপদে ফিরে না আসবেন আমি তোমার চেহারাও দেখব না। সেই সাহাবী তৎক্ষণাৎ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং মদীনা থেকে তিন মঞ্জিল দূরত্বে গিয়ে ইসলামী সৈন্যদলের সাথে যোগদান করেন। এরপর তিনি তখনই বাড়ি ফেরেন যখন মহানবী (সা.) তাঁর অন্যান্য সাহাবীর সাথে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বস্তুত, তারা এমন মানুষ ছিলেন যারা প্রত্যেক বিপদের মুহূর্তে নির্দ্বিধায় নিজেদের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। যত দুঃখকষ্ট তারা ভোগ করেছেন সেগুলোকে তারা দুঃখকষ্ট মনে করেন নি, বরং যখনই কোনো সেবা করার সুযোগ এসেছে, তারা সানন্দে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

যাহোক, এর বিশদ বিবরণে আরো লেখা আছে, পনেরোটি বা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী উনিশটি স্থানে যাত্রাবিরতি দিয়ে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাবুক নামক স্থানে পৌঁছেন। তাবুকের এই যাত্রায় যেসব স্থানে শিবির স্থাপন করা হয়েছিল তার পৃথক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। যদিও পরবর্তীকালে সেসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল আর সেই স্থানগুলোর নামে মসজিদের নামকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিকগণ এথেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সম্ভবত এই স্থানগুলোতেই মহানবী (সা.) অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এই স্থানগুলোর নামও (ইতিহাসের) গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে, যা পনেরো থেকে বাইশটি পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়।

'সীরাত ইবনে ইসহাক' এবং 'ইবনে হিশাম'-এ যে সতেরোটি স্থানে মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো– যু-খুশুব, ফাইফা, যুল-মারওয়াহ, রুক'আ, ওয়াদিউল কুরা, সা'ঈদ, হিজর, সাদরে হাওযা, যুল-জীফাহ্, শিক তারা, আল-বাতরা, আলা', যাতুল খিতমী, আখযার, যাতুল যিরাব, সানিয়্যাতু মিদরান এবং তাবুক।

একটি রেওয়ায়েতে আছে, হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা তাবুকের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে যাত্রা করি। এক রাতে মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন। [বেশ দীর্ঘ সফর ছিল, ক্লান্তি ছিল।] তিনি (সা.) যখন জাগ্রত হন তখন সূর্য এক বর্শা পরিমাণ ওপরে উঠে গিয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, হে বেলাল! আমি কি তোমাকে বলি নি, আমাদের জন্য ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? [অর্থাৎ জেগে থাকবে আর আমাদেরকে জাগিয়ে দেবে।] হযরত বেলাল (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার মতো আমাকেও ঘুমে পেয়ে বসেছিল, নিদ্রা আমাকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) সেনাদলকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন আর কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর বাহন থেকে নেমে সুন্নত আদায় করেন এবং সাহাবীদের নিয়ে (ফজরের) নামায পড়েন। এরপর

মহানবী (সা.) সারাদিন এবং সারারাত সফর অব্যাহত রাখেন, এমনকি পরের দিন প্রত্যুষে তিনি (সা.) তাবুকে পৌঁছেন। [যদিও এটি লেখা নেই, তবে নিশ্চিতভাবে বাকি সময়েটিতে নামাযের সময়ে নামায পড়া হয়েছে; নামাযের জন্য বিরতি দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই।] সেখানে গিয়ে, অর্থাৎ তাবুকে পৌঁছে মহানবী (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তণের পর বলেন, হে লোকসকল! সর্বাধিক সত্য বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব, সবচেয়ে দৃঢ় হাতল হলো তাকওয়ার কথা, সর্বোত্তম ধর্মাদর্শ হলো হযরত ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, সর্বোৎকৃষ্ট সুন্নত হলো মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত, সর্বোত্তম যিকর হলো আল্লাহ্‌র স্মরণ, সর্বোত্তম বৃত্তান্ত হলো এই কুরআন এবং সর্বোত্তম কাজ হলো সেটি যা দৃঢ় সংকল্পের সাথে করা হয়, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম হলো বিদ'আত (ধর্মের বিষয়ে নতুন উদ্ভাবন), আর সর্বোত্তম জীবনাদর্শ হলো নবীদের জীবনাদর্শ, আর সবচেয়ে উত্তম মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু, আর হিদায়াত লাভের পর সবচেয়ে বড়ো অন্ধত্ব হলো পথভ্রষ্টতা, আর সর্বোত্তম আমল হলো সেগুলো যা উপকারী, আর সর্বোত্তম হিদায়াত হলো সেটি যার অনুসরণ করা হয়, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অন্ধত্ব হলো হৃদয়ের অন্ধত্ব; [চোখের অন্ধত্ব নয়, (বরং) হৃদয়ের অন্ধত্ব, যখন আল্লাহ্ তা'লার বাণী মানুষ বুঝতে পারে না;] এরপর বলেন, দাতার হাত গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম, আর যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও যথেষ্ট তা উদাসীনতা সৃষ্টিকারী প্রাচুর্য অপেক্ষা উত্তম, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অজুহাত সেটি যা মৃত্যুর সময় উপস্থাপন করা হয়, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট লজ্জা হবে কিয়ামত দিবসের লজ্জা, আর কিছু লোক (জুমুআর) নামাযের জন্য অনেক দেরিতে আসে এবং কিছু লোক এমনও আছে যারা কখনো কখনো আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে (কখনো করে না), আর সবচেয়ে বড়ো পাপগুলোর মধ্যে একটি পাপ হলো মিথ্যা বলা, আর যার মন বড়ো সে-ই সবচেয়ে ধনী; [অর্থাৎ মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে নামায আদায় করা এবং দেরিতে নামাযে আসা লোকদেরকেও তিনি (সা.) পছন্দ করেন নি; তিনি বলেন, এটি খুবই মন্দ বিষয়;] তিনি বলেন, মহাপাপগুলোর মধ্যে একটি পাপ হলো মিথ্যা বলা, আর যার মন বড়ো সে-ই সবচেয়ে ধনী, আর সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া এবং পরম বিচক্ষণতা হলো খোদাভীতি, আর সর্বোত্তম কথা হলো তা যা হৃদয়ে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সন্দেহ করা হলো এক প্রকার কুফরী, আর বিলাপ করা অজ্ঞতার যুগের প্রথা এবং খিয়ানত হলো জাহান্নামের আগুনসম, আর মন্দ কবিতা হলো শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং মদ হলো বহুবিধ পাপের উৎস, আর নারীরা শয়তানের ফাঁদ এবং যৌবন এক প্রকার উন্মাদনা, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো সুদের উপার্জন এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট আহার হলো অনাথের সম্পদ গ্রাস করা, আর সৌভাগ্যবান সে যে অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং দুর্ভাগা সে যে মায়ের পেট থেকেই দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মায়, আর তোমাদের প্রত্যেকেই চার হাত জমির দিকে ধাবমান; [অর্থাৎ অবশেষে মৃত্যু হবেই, কবরে যেতে হবে;] আর সকল বিষয় পরিণতির ওপর নির্ভরশীল এবং কাজের মূল্যায়ন ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল, আর সবচেয়ে মন্দ বর্ণনাকারী হলো মিথ্যা বর্ণনাকারী এবং ভবিতব্য সবই নিকটবর্তী, আর মু'মিনকে গালি দেওয়া হলো পাপ এবং মু'মিনের সাথে যুদ্ধ করা হলো কুফরী, আর মু'মিনের গীবত করা হলো আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা এবং তার সম্পদের পবিত্রতাও তার রক্তের পবিত্রতারই অনুরূপ, আর যে আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা (ও ভ্রান্ত) শপথ করে তিনি তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবেন এবং যে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে তিনি তাকে ক্ষমা করবেন, আর যে তার ভাইকে ক্ষমা করবে আল্লাহ্‌ও তাকে ক্ষমা করবেন এবং যে নিজের ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ্ তাকে পুরস্কার দেবেন, আর যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ্ তাকে এর প্রতিদান দেবেন

এবং যে খ্যাতি পছন্দ করবে আল্লাহ্ তাকে খ্যাতি দেবেন, আর যে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহ্ তাকে দ্বিগুণ দেবেন এবং যে আল্লাহ্র অবাধ্যতা করবে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। তিনি (সা.) এই কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করেন। তারপর বলেন, আমি আল্লাহ্র কাছে আমার এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তাবুকের সফরে তিনি (সা.) সাহাবীদের কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তাবুকের সফরে মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে সাহাবীদেরকে একক বা সমষ্টিগত উপদেশ প্রদান করেছেন যার মধ্যে কিছু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণনা করেছেন, তাবুকের বছর মহানবী (সা.) তাঁর বাহনে হেলান দিয়ে লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি (সা.) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম এবং নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে বলব না? নিশ্চয় মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো সেই ব্যক্তি যে তার ঘোড়া বা উটের পিঠে আরোহণ করে অথবা পায়ে হেঁটেই আমৃত্যু আল্লাহ্র পথে কাজ করে, এবং নিশ্চয় মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম পাপী ব্যক্তি সে– যে আল্লাহ্র কিতাব পড়ে ঠিকই, কিন্তু তার মূর্খতা পরিত্যাগ করে এর কোনো কথার দিকে ফিরে আসে না। এখন দেখুন! আজকাল অনেক মানুষ পবিত্র কুরআন পড়ার দাবি করে ঠিকই, কিন্তু কেউ তা পালন করে না।

হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তাবুকে সাহাবীদের সম্বোধন করে বলেন, মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি অতুলনীয় যে তার ঘোড়ায় আরোহণ করে আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদ করে এবং মানুষের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকে। আর দ্বিতীয়ত সেই ব্যক্তি অনন্য যে প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব রাখে এবং তার অতিথিকে আপ্যায়ন ও সম্মান করে এবং তাকে তার অধিকার প্রদান করে।

এই সময়ে হিরাক্লিয়াসকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্রের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) যখন তাবুকে পৌঁছেন তখন হিরাক্লিয়াস অর্থাৎ রোমের সম্রাট, [তার নাম ছিল হিরাক্লিয়াস,] সেই সময় হিমস-এ ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, যে আমার পত্র কায়সার তথা রোমসম্রাটের কাছে নিয়ে যাবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। এক ব্যক্তি নিবেদন করেন, যদি সে এই পত্র গ্রহণ না করে– তবুও? তিনি (সা.) বলেন, সে গ্রহণ না করলেও। যাহোক, এটি নিয়ে যাও। অতএব সেই ব্যক্তি তাঁর (সা.) পত্র নিয়ে যায় এবং হিরাক্লিয়াসকে দিয়ে দেয়। সে তা পড়ে এবং বলে, তুমি তোমার নবীর কাছে চলে যাও এবং তাকে বলে দাও, আমি তাঁকে মান্য করছি, কিন্তু আমি আমার রাজত্ব ছাড়তে চাই না। সে কিছু দিনারও তাঁর (সা.) সমীপে প্রেরণ করে। সেই ব্যক্তি ফিরে আসে এবং তাঁকে (সা.) তার সম্পর্কে বলে। তখন তিনি (সা.) বলেন, সে মিথ্যা বলেছে, সে সত্য কথা বলে নি; আর তিনি (সা.) দিনারগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। হিরাক্লিয়াসের কাছে এই পত্র হযরত দিহইয়া নিয়ে গিয়েছিলেন। এটি সেই পত্র নয় যা মহানবী (সা.) হযরত দিহইয়ার হাতে ষষ্ঠ হিজরী সনের শেষে পাঠিয়েছিলেন যা সপ্তম হিজরীর মুহাররম মাসে তার কাছে পৌঁছায়। ইমাম ইবনে হাজর কিতাবুল মাগাযী এবং সীরাতের বর্ণনার সূত্রে এই মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, যখন মহানবী (সা.) তাবুকে ছিলেন তখন তিনি রোমসম্রাট প্রমুখকে দ্বিতীয়বার পত্র লিখেছিলেন। তার মতামতের সমর্থন সেসব পত্র থেকেও পাওয়া যায় যা বই আকারে **১৯৪১** সালে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ের নাম 'মাজমুআ আল-ওয়াসায়েকুস সিয়াসিয়্যাহ লিল-

আহদিন নাবভী ওয়াল-খিলাফাতির রাশিদাহ', এর লেখক হলেন ডক্টর হামিদুল্লাহ্। এতে নবুওয়তের যুগ থেকে নিয়ে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক দলিলের উল্লেখ রয়েছে। এই বই প্রথমবার মিশর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪১ সালে। যাহোক, এটি সেই বইয়ের উদ্ধৃতি এবং এর বক্তব্য অনুযায়ী রোমসম্রাটের কাছে দুটি পত্র পাঠানো হয়েছিল। প্রথম পত্রে বলা হয়েছিল, সে যেন তার প্রজাদের ইসলাম গ্রহণে বাধা না হয়, অন্যথায় তার প্রজাদের পাপের দায়ভারও তার ওপরই বর্তাবে এবং এই পত্র রোমসম্রাটের কাছে ষষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে দিহইয়া কালবীর হাতে পাঠানো হয়েছিল। আর দ্বিতীয় পত্রে বলা হয়েছিল– ইসলাম গ্রহণ করো, অন্যথায় অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে জিযিয়া দিতে হবে। এই পত্রও মহানবী (সা.) হযরত দিহইয়ার হাতে তাবুক যুদ্ধের সময় রোমসম্রাটের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ইতিহাসে আয়লাবাসীদের সাথে সন্ধিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে, মহানবী (সা.) যখন তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে যান তখন চতুর্দিকের খ্রিষ্টান শাসকরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা এমন ত্রাস সঞ্চার করেন যে, কিছুদিন পূর্বেও যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, তারাই এখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে আর তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সন্ধির আবেদন করতে থাকে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম আয়লার শাসক উপস্থিত হয়। আয়লা লোহিত সাগরের তীরে সিরিয়ার নিকটবর্তী একটি ছোটো শহর। এটি হেজাযের শেষ সীমা এবং সিরীয় ভূমি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে অবস্থিত। তাবুকে অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে আয়লার শাসক ইউহান্না বিন রুবা উপস্থিত হয়; তার সাথে সিরিয়া, ইয়েমেন, বাহর (তথা লোহিত সাগর), জারবা ও আযরুহ্-র অধিবাসীরাও আসে এবং তারাও শান্তিচুক্তির আবেদন জানায়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের জন্যও একটি নিরাপত্তা স্মারক লিপিবদ্ধ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) লেখেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটি আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর নবী ও রসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে ইউহান্না বিন রুবা এবং আয়লার অধিবাসীদের সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজসমূহ এবং তাদের স্থলে চলাচলকারী কাফেলাগুলোর জন্য নিরাপত্তা স্মারক। তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পক্ষ থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হলো। এভাবে তাদের সাথে সাথে সিরিয়া, ইয়েমেন, (লোহিত) সাগরের অধিবাসীদেরকেও পূর্ণ নিরাপত্তা সরবরাহ করা হবে। কেউ যদি কোনো বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা বৈধ হবে। কেউ যদি এমন ব্যক্তির সম্পদ ছিনিয়ে নেয় তবে সেটি তার জন্য বৈধ হবে; অর্থাৎ (শান্তিচুক্তি) ভঙ্গকারীদের। তাদেরকে কোনো ঝরনা অথবা কুপের পানি ব্যবহার করতে বাধা দেওয়া হবে না এবং জল ও স্থলপথে তাদেরকে বাধা দেওয়া হবে না। আয়লার অধিবাসীদের এবং ইউহান্না বিন রুবার জন্য এই নিরাপত্তা স্মারক হযরত জুহায়ম বিন সালত (রা.) এবং হযরত শারাহবিল বিন হাসানা (রা.) রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে লিপিবদ্ধ করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ইউহান্না একটি সাদা খচ্চর এবং একটি পরিধেয় চাদর উপহার দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ইয়েমেনী চাদর পরিধান করান এবং হযরত বেলাল (রা.)-র সাথে তাকে রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর মাকনার অধিবাসীদের সাথে সন্ধি হয়। মাকনার অধিবাসীরা ইহুদী ছিল এবং এই বসতি সমুদ্রতীরে আয়লার নিকটে অবস্থিত ছিল। এরাও রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়। তিনি (সা.) তাদেরকেও নিরাপত্তা স্মারক লিখে দেন–

انّهم آمنون بامان الله و امان محمدٍ و انّ عليهم ربع غزولهم و ربع ثمارهم

এরা আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নিরাপত্তায় রয়েছে। জিযিয়াস্বরূপ তাদের কাটা সুতা, বোনা কাপড় ও ফলফলাদির এক চতুর্থাংশ দিতে হবে। একইভাবে জারবা এবং আযরুহ্-র অধিবাসীদের জন্যও নিরাপত্তা স্মারক লিখে দেবার উল্লেখ পাওয়া যায়। জারবা এবং আযরুহ্ এই দুটি স্থান সিরিয়ার বালকা এলাকায় অবস্থিত দুটি শহর ছিল, যে দুটি পরস্পর খুব নিকটে অবস্থিত ছিল। তাদের মাঝে শুধু তিন মাইলের দূরত্ব ছিল। তবে একটি বক্তব্য অনুযায়ী এক মাইলের চেয়েও কম দূরত্ব ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) জারবা এবং আযরুহ্-র জন্যও নিরাপত্তা স্মারক লিখে দেন। তিনি লেখেন,

هذا كتاب من محمد النبى لاهل جرباء و اذرح انّهم آمنون بامان الله و امان محمد و انّ عليهم مائة دينار فى كلّ رجب وافية طيبّة و الله كفيل عليهم

এই লেখা আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মদ (সা.) এর পক্ষ থেকে জারবা এবং আযরাহ এর অধিবাসীদের নামে। এরা আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর নিরাপত্তায় রয়েছে। তাদের জন্য প্রতি বছর রজব মাসে খাঁটি সোনার একশ দিনার জিযিয়াস্বরূপ আদায় করা আবশ্যক হবে। আল্লাহ্ই তাদের তত্ত্বাবধায়ক।

তাবুক যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি সারিয়্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সারিয়্যাটি উকায়দার বিন আব্দুল মালিকের প্রতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের নামে আখ্যায়িত হয়। মহানবী (সা.) তাবুকেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে নবম হিজরী সনের রজব মাসে চারশ বিশজন আরোহীসহ একটি সেনাদল দিয়ে উকায়দার বিন আব্দুল মালিকের প্রতি জুমাতুল জান্দাল অভিমুখে প্রেরণ করেন। দুমাতুল জান্দাল সিরিয়া এবং মদীনার মধ্যবর্তী একটি দুর্গ ও জনপদ যেটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পনেরো-ষোল দিনের দূরত্বে অবস্থিত। তাবুক থেকে চারশ কিলোমিটার দূরত্বে এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। উকায়দার বনু কিন্দা গোত্রের লোক ছিল এবং এর বাদশা ছিল। সে খ্রিষ্টান ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত খালিদকে বলেন, তুমি তাকে রাতের বেলা গরু শিকার করা অবস্থায় দেখতে পাবে; তখন তুমি তাকে পাকড়াও করবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এই দৃশ্য মহানবী (সা.)-কে দেখি দিয়েছিলেন যে, এই অবস্থা হবে; আর এ অবস্থায় যদি তোমরা আক্রমণ করো তবে তোমরা তাকে ধরতে সমর্থ হবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের হাতে দুমা জয় করবেন। যদি তোমরা তাকে বাগে পাও তাহলে তোমরা তাকে হত্যা কোরো না, বরং আমার নিকট নিয়ে এসো। যদি সে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধ করে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা তাকে হত্যা কোরো। হযরত খালিদ (রা.)-র যাত্রা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সেদিকে যাত্রা করেন এবং সেই দুর্গের এত কাছাকাছি পৌঁছে যান যে, সামনে সেটি দেখা যাচ্ছিল। পূর্ণিমার রাত ছিল, উকায়দার তার স্ত্রী রিবাব বিনতে উনায়ফ কিন্দিয়ার সাথে ছাদে অবস্থান করছিল। এমন সময় একটি বন্য গরু আসে, সেটি নিজের শিং দিয়ে দুর্গের দরজায় আঘাত করতে থাকে। উকায়দারের স্ত্রী তাকে বলে, তুমি কি কখনো জঙ্গল থেকে কোনো বন্য গরুকে এভাবে এসে প্রাসাদের দরজায় নিজ শিং দিয়ে আঘাত করতে দেখেছ? উকায়দার বলে, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনও এমনটি দেখি নি। তখন সেই মহিলা বলে, এটিকে কে হাতছাড়া করতে পারে! তখন সে অর্থাৎ বাদশা বলে, কেউই না! আমি এখনই এটিকে শিকার করে নিয়ে আসছি। সুতরাং সে ছাদ থেকে নেমে আসে আর (অন্যদেরকে) ঘোড়ায় আরোহণ করার নির্দেশ দেয়। তার সাথে তার পরিবার-পরিজনের একটি দলও আরোহণ করে। তাদের মধ্যে হাসসান নামের তার এক

ভাইও ছিল। সুতরাং সে ঘোড়ায় আরোহণ করে এবং তার সাথে সেই গরুটির পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। সেই শিকারীরা যখন হন্যে হয়ে সেই শিকারের পেছনে ছুটছিল তখন আচমকা সামনে থেকে হযরত খালিদ (রা.)-র অশ্বারোহী বাহিনী তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাদেরকে তারা বন্দি করে ফেলে। উকায়দারকে তারা বন্দি করে নেয়, কিন্তু হাসসান বন্দি হতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের প্রতিরোধ করে, অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। তাই তাকে হত্যা করা হয়। হাসসান নিহত হয় আর তখন তার মাথায় মোটা রেশমের চাদর ছিল যাতে সোনার সুতা খচিত ছিল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সেই চাদর মহানবী (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এরপর তিনি নিজে উকায়দারকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন।

এর বিস্তারিত বিবরণে আরো লেখা আছে, যখন উকায়দারকে বন্দি করা হয় এবং তার ভাই হাসসানকে হত্যা করা হয় তখন হযরত খালিদ উকায়দারকে বলেন, আমি কি তোমাকে এই শর্তে আশ্রয় দেবো যে, তোমাকে আমি মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হবার সুযোগ দেবো আর তুমি আমাকে দুমাতুল জান্দাল বিজয় করিয়ে দেবে? তখন উকায়দার বলে, ঠিক আছে। এ কথা শুনে হযরত খালিদ তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং তারা দুর্গের একেবারেই নিকটে চলে আসেন। উকায়দার তার বাড়ির লোকজনকে ডেকে বলে, তারা যেন দরজা খুলে দেয়। যখন তারা দরজা খুলতে মনস্থ করে তখন উকায়দারের ভাই মুযাত দরজা খুলতে অস্বীকৃতি জানায়। উকায়দার তখন হযরত খালিদকে বলে, তোমরা বুঝতেই পারছ, তারা এজন্য দরজা খুলতে চাচ্ছে না কারণ তারা আমার হাতে তোমাদের পরানো হাতকড়া দেখে ফেলেছে। তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও; আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এবং আমানতের দোহাই দিয়ে বলছি, আমি তোমাদের জন্য দুর্গের দরজা খুলে দেবো। শর্ত হলো, তোমরা আমার পরিবার সম্পর্কে আমার সাথে সন্ধি করে নেবে। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, ঠিক আছে, আমি তোমার সাথে সন্ধি করব। উকায়দার বলে, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে (বণ্টনের ক্ষেত্রে) বিচারক হিসেবে মেনে নেব, আর তোমরা যদি চাও তাহলে আমাকে বিচারক হিসেবে মেনে নিতে পারো। হযরত খালিদ (রা.) বলেন, আমরা তোমার নিকট থেকে তা-ই গ্রহণ করব যা তুমি প্রদান করবে। সুতরাং হযরত খালিদ (রা.) তাকে ছেড়ে দেন। উকায়দার দুর্গের ফটক খুলে দেয়। উকায়দারের ভাই মুযাতকেও বন্দি করা হয় আর সেই সব জিনিসপত্র আদায় করে নেওয়া হয় যেগুলো সম্পর্কে সন্ধি করা হয়েছিল। এই অভিযানে মুসলমানরা দুই হাজার উট, আটশ ক্রীতদাস, চারশ লৌহবর্ম এবং চারশ বর্শা লাভ করে। এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর এক পঞ্চমাংশ পৃথক করার পর অবশিষ্ট সম্পদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

উকায়দার এবং তার ভাইকে মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থাপন করার উল্লেখও পাওয়া যায়। এর বর্ণনাটি এরূপ: হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, যখন হযরত খালিদ (রা.) উকায়দারকে নিয়ে আসেন তখন আমি তাকে দেখেছি; সে সোনার তৈরি ক্রুশ এবং রেশমের তৈরি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিল। সে যখন মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তিনি (সা.) তাকে দুইবার বলেন, না, না! সিজদা কোরো না! সে মহানবী (সা.)-কে কিছু জিনিস উপঢৌকনস্বরূপ পেশ করে যার মাঝে একটি অলংকারখচিত কাপড় এবং একটি খচ্চর ছিল। জিযিয়া (বা যুদ্ধকর) প্রদানের শর্তে মহানবী (সা.) তার সাথে সন্ধি করেন। ইবনে আসীরের বর্ণনামতে, তাদের জিযিয়ার পরিমাণ ছিল তিনশ দিনার। মহানবী (সা.) তাকে ও তার ভাইকে প্রাণভিক্ষা দেন, তাদেরকে স্বাধীন করে

দেন। মহানবী (সা.) তাদের জন্য যে শর্তাবলির অধীনে সন্ধি হয়েছিল, সেগুলো সম্বলিত নিরাপত্তা স্মারক লিখিয়ে দেন। নিরাপত্তা স্মারকটি নিম্নরূপঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ পত্রটি মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে হযরত খালিদ (রা.)-র সাথে উকায়দারের জন্য, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং প্রতিমার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। [অর্থাৎ এটি থেকে জানা যায়, সে ইসলামও গ্রহণ করেছিল।] এই বিধানটি দুমাতুল জান্দাল ও এর আশেপাশে বসবাসরত মানুষের জন্য। আমাদের ভাগে থাকবে চাষাবাদের অনুপোযোগী জমি (তথা অকেজো ও অনাবাদি জমি), যুদ্ধাস্ত্র, উট এবং দুর্গ, আর তোমাদের ভাগে থাকবে শহরের অভ্যন্তরীণ অংশের খেজুর বাগানসমূহ; অর্থাৎ প্রথমোক্ত জিনিসগুলো মুসলমানদের ভাগে থাকবে; আর তোমাদের ভাগে থাকবে শহরের অভ্যন্তরীণ অংশের খেজুর বাগানসমূহ, ঝরনাময় আবাদি জমি। গবাদিপশু পৃথকভাবে গণনায় ধরা হবে না। তোমাদেরকে এখানে তোমাদের পশুচারণের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হবে না। তোমরা সময়মত নামায আদায় করবে, পূর্ণরূপে যাকাত আদায় করবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার সাথে তোমাদের কৃত অঙ্গীকার। তোমাদের জন্য সততা ও বিশ্বস্ততা একান্ত আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এবং প্রত্যেক মুসলমান এ বিষয়ে সাক্ষী।

তাবুকের যুদ্ধের বর্ণনায় একজন সাহাবীর মৃত্যু এবং তার (রা.) সমাহিত হবার বর্ণনাও পাওয়া যায়, যা দেখে কতক শীর্ষস্থানীয় সাহাবী (রা.) আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন, হায়! সমাহিত এই ব্যক্তির পরিবর্তে যদি তারা স্বয়ং হতেন! হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, তাবুকের যুদ্ধে আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। একবার আমি মাঝরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে সেনাশিবিরের এক প্রান্তে আগুনের আলো দেখতে পাই। তাই আমি সেখানে কী হচ্ছে তা দেখতে যাই; গিয়ে দেখি– মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) সেখানে রয়েছেন। আমি দেখলাম, হযরত আব্দুল্লাহ্ যুল বিজাদায়ন মুযনী (রা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁরা তার (রা.) কবর খনন করে ফেলেছিলেন। মহানবী (সা.) কবরের ভেতরে ছিলেন আর হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) উভয়ে তার মরদেহটি তাঁর (সা.) কাছে দিচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) বলছিলেন, তোমরা দুইজন তোমাদের এই ভাইকে আমার কাছে দাও। অতঃপর তাঁরা দুইজন হযরত আব্দুল্লাহ্ যুল বিজাদায়নের (রা.) মরদেহ মহানবী (সা.)-এর হাতে তুলে দেন। তিনি (সা.) নিজ হাতে এই মরদেহটি কবরে রাখেন। অতঃপর তিনি (সা.) দোয়া করেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ رَاضِيًا عَنْهُ فَارْضَ عَنْهُ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি আজ সন্ধ্যা পর্যন্তও তার (রা.) প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম, সুতরাং তুমিও তার (রা.) প্রতি সন্তুষ্ট থাক। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার তখন আকাঙ্ক্ষা হয়– হায়! এই কবরে সমাহিত ব্যক্তিটি যদি আমি হতে পারতাম এবং এই দোয়া পেতাম!

হযরত আব্দুল্লাহ্ যুল বিজাদায়ন ছিলেন বনু মুযায়না গোত্রের সদস্য। শৈশবেই তার পিতার মৃত্যু হয়। উত্তরাধিকার হিসেবে তিনি কিছুই পান নি। তার চাচা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তার চাচা তাকে লালনপালন করেন। এভাবে তিনিও সম্পদশালী হন এবং চাচার সাথে ব্যাবসা আরম্ভ করেন। আর তিনি (রা.) মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার চাচা তার কাছ থেকে সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়, এমনকি তার

পরনের কাপড়টুকুও রেখে দেয়। [কোমরে যে কাপড় জড়ানো হয় সেটিও কেড়ে নেয়।] তখন তার (রা.) মা আসেন এবং নিজের চাদর দু-টুকরো করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ এর একটি টুকরো লুঙ্গি হিসেবে পরিধান করেন এবং অপর টুকরোটি নিজের গায়ে জড়িয়ে নেন। অতঃপর তিনি মদীনায় আসেন এবং মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখন লোকদের দিকে মনোযোগ সহকারে তাকাতেন, কারা কারা উপস্থিত আছে, অপরিচিত কেউ আছে কি না। যখন তিনি (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্‌র দিকে তাকালেন তখন তাকে অপরিচিত মনে করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? হযরত আব্দুল্লাহ্ তখন নিজ বংশপরিচয় তুলে ধরেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, তিনি নিবেদন করেন, আমার নাম আব্দুল উযযা। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি হলে আব্দুল্লাহ্ যুল বিজাদায়ন, অর্থাৎ দুই চাদরের অধিকারী। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার সাহচর্যে থাকবে। ফলে তিনি মহানবী (সা.)-এর অতিথিদের মধ্যে শামিল হন এবং মহানবী (সা.) তাকে কুরআন শেখাতেন। এমনকি তিনি পবিত্র কুরআনের অনেক অংশ মুখস্থ করে ফেলেন। মহানবী (সা.) যখন তাবুক অভিমুখে রওয়ানা হন তখন তিনি (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্য শাহাদাত লাভের দোয়া করুন। তিনি (সা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! আমি তার রক্তকে কাফিরদের জন্য হারাম করছি। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার উদ্দেশ্য তো এটা ছিল না। তখন মহানবী (সা.) বলেন, যখন তুমি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে, তারপর যদি তুমি জ্বরে আক্রান্ত হয়েও মৃত্যুবরণ করো, তবুও তুমি শহীদ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি তোমার বাহন তোমাকে নীচে ফেলে দেয় আর তাতে তোমার ঘাড় ভেঙ্গে যায়, তাহলেও তুমি শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। শাহাদাত কীভাবে লাভ হবে– এটি নিয়ে চিন্তিত হয়ো না। আর তাবুকে পৌঁছার কয়েক দিন পরেই অসুস্থতার কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এই সফরে হযরত মুয়াবিয়া বিন মুয়াবিয়া মুযনীর জানাযার নামাযেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাবুকে অবস্থানকালে হযরত জিব্রাঈল (আ.) আগমন করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হযরত মুয়াবিয়া মুযনী (রা.) মদীনায় মৃত্যুবরণ করেছেন, তার জানাযার নামায পড়ুন। [আল্লাহ্ তা'লা হযরত জিব্রাঈলের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে এই সংবাদ জানিয়ে দেন।] এরপর দিব্যদর্শনে তার মরদেহ বহনকারী খাটিয়াটি শূন্যে উত্থিত করা হয় এবং মহানবী (সা.)-এর চোখে দৃশ্যমান করা হয়। মহানবী (সা.) তখন জানাযার নামায আদায় করেন। মহানবী (সা.)-এর সামনে ফেরেশতারাও সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত জিব্রাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, তাকে যে দিব্যদর্শনে দেখানো হলো এবং আমাকে তার জানাযা পড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হলো– এই পদমর্যাদা সে কীভাবে লাভ করল? জিব্রাঈল তখন উত্তর দেন, সূরা কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (অর্থাৎ সূরা ইখলাস)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণে। তিনি উঠতে-বসতে, আরোহিত অবস্থায় এবং পদব্রজে– সর্বাবস্থায় এই সূরা তিলাওয়াত করতেন।

এ-ও উল্লেখ আছে যে, মহানবী (সা.) তাবুকে পৌঁছে আরো সামনে অগ্রসর হবার বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) সামনে অগ্রসর হবার বিষয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করেন। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনাকে যদি সামনে অগ্রসর হবার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে আপনি অবশ্যই এগিয়ে চলুন; আমরাও আপনার সাথে যাব। মহানবী (সা.) তখন বলেন,

সামনে অগ্রসর হবার বিষয়ে যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আমার কাছে কোনো নির্দেশ আসত, তাহলে আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ করতাম না। তখন হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! রোমানদের কাছে অনেক বড়ো সেনাবাহিনী রয়েছে, তাদের কেউই মুসলমান না। আমরা তাদের খুব নিকটে চলে এসেছি। আপনার নিকটে আসাই তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করে দিয়েছে। আমরা এ বছর ফিরে যাই, যতক্ষণ না কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি অথবা আল্লাহ্ তা'লা কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন। যাহোক, একথা শুনে মহানবী (সা.) তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করার পর ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য একটি বর্ণনা মোতাবেক তিনি ২০ দিনের কম সময় তাবুকে অবস্থান করেছিলেন। এ দুটি ভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। ২০ দিনের বর্ণনায় তাবুকে পৌঁছার এবং তাবুক থেকে ফিরতি যাত্রার দুইটি দিনও গণনা করা হয়েছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় বর্ণনায় এ দুদিন গণনা করা হয় নি।

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে মদীনায় ফিরে আসতে দুই মাস বা তারও বেশি সময় লেগেছিল। ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ৯ম হিজরীর রজব মাসে এই যুদ্ধের জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন এবং ৯ম হিজরীর রমযান মাসে মদীনায় ফিরে আসেন। এই দুই মাসের মধ্যে শাবান মাসও ছিল। এই হিসেবে দুই মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার বাইরে অবস্থান করেছিলেন। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-ও এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, তিনি (সা.) যখন সিরিয়ার নিকটবর্তী তাবুক অঞ্চলে পৌঁছান তখন তিনি (সা.) সার্বিক পরিস্থিতি জানার জন্য আশপাশে লোক পাঠান। এই দূতেরা ফিরে এসে সবাই একই কথা জানান যে, কোনো সিরীয় বাহিনী এখনো সমবেত হচ্ছে না। হযরত উমর (রা.)-ও এ কথাই বলেছিলেন যে, যুদ্ধের জন্য কেউ আসছে না এবং আশপাশের অনেক অঞ্চল এখনো ভীতসন্ত্রস্ত; তাই যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করেন এবং আশপাশের কিছু গোত্রের সাথে চুক্তি করে বিনা যুদ্ধেই ফিরে আসেন। এ পুরো সফরটি দুই থেকে আড়াই মাসের ছিল।

মদীনায় ফেরার সফরের বিস্তারিত বর্ণনা আগামীতে বর্ণনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

বাংলাদেশের জন্য আগেও দোয়ার জন্য বলেছিলাম। সেখানে মোল্লা শ্রেণি, আহমদীয়াতের বিরোধীরা প্রচুর গোলযোগ সৃষ্টি করছে। সম্ভবত আগামীকাল তাদের একটি বড়ো সমাবেশও আছে। তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে নিরাপদ রাখুন, তাদের অশুভ চক্রান্ত থেকে সুরক্ষা করুন। একইভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও নিরাপদে রাখুন। এখন অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন। বিরুদ্ধবাদীদের ওপর যে উপলক্ষ্যেই চাপ প্রয়োগ করা হোক না কেন, আইনগতভাবেও তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়– তাদের আক্রোশ ঘুরে-ফিরে আহমদীদের ওপরই গিয়ে পড়ে। এজন্য আহমদীদের আরো বেশি দোয়া ও সতর্কতা অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। অনুরূপভাবে ফিলিস্তিনীদের জন্যও দোয়া করুন। শান্তিচুক্তি ও যুদ্ধবিরতি থাকা সত্ত্বেও তাদের ওপর আগের মতোই গণহত্যা চালানো হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি কৃপা করুন। একইভাবে আফ্রিকার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। কিছু দেশে সরকারিভাবেও তাদের ওপর অত্যাচার চলছে, আবার কোথাও কোথাও সন্ত্রাসীরা হামলা চালাচ্ছে, এতে মাঝে মাঝে আহমদীরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করুন।

নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা আদায় করব, যা রাবওয়া নিবাসী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের পুত্র মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের; সম্প্রতি তিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম মূসী ছিলেন এবং জীবদ্দশাতেই হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা ও চার পুত্র রেখে গেছেন। তার ছেলে মুহাম্মদ ইমরান সাহেব পশ্চিম আফ্রিকার নাইজারে মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্বরত আছেন এবং কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। একইভাবে আরেক পুত্র মুহাম্মদ লুকমান সাহেব ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং মুয়াল্লেম সিলসিলাহ্ হিসেবে কাজ করছেন। তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় ১৯৫৬ সালে তাদের পিতা মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের মাধ্যমে, আর দুই বছর পর তারা রাবওয়ায় স্থানান্তরিত হন। মরহুম নিজে নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতকারী, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, পুণ্যবান, আন্তরিক ও দোয়ায় অভ্যস্ত মানুষ ছিলেন।

মুয়াল্লিম মুহসিন তৈয়ব সাহেব লেখেন, আমি তার এলাকায় পাঁচ বছর সেবা করার সৌভাগ্য পাই। আমি তার মাঝে যে বিশেষ গুণ দেখতে পাই তা হলো– তিনি আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে খুবই অগ্রগামী ছিলেন। কোনো তাহরীকের নতুন বছরের সূচনা হলে সবসময় চেষ্টা করতেন যেন প্রথম রশিদটি তার নামে কাটা হয়। কখনো কখনো নতুন বছরের ঘোষণা হবার আগেই চাঁদা দিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেন। আবার একইভাবে বছরের শেষে অতিরিক্ত চাঁদা আদায়ের কথা বলা হলে তিনি সাধ্যানুসারে তা-ও বাড়িয়ে দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করুন, তার পরিবারকে ধৈর্য ও মনোবল প্রদান করুন; বিশেষ করে তার যে-সব পুত্র বিদেশে রয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য দিন, সাহস দিন এবং মরহুমের পুণ্যগুলো অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)